International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 44-47
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

স্রষ্টা হরিচরণ: অভিধান রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি

ড. সোমা কুশারী
সহকারী শিক্ষিকা, মণ্ডল পাড়া বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামনগর, কলকাতা, ভারত

Abstract

The name of erudite scholar and lexicographer Haricharan Bandhyopadhyay has entered into the world of oblivion of Bengalee readers.But with direct inspiration of our legendary and iconic poet Rabindranath Tagore he joined as a teacher in the formative period of Santiniketan school.With his single-handed endeavour of 40 years he published his "Bangiya Shabdo Kosh" in 105 volumes by his own expenditure in 1905.In the 150th year of his birth anniversary each and every inquisitive reader and researcher expressed their heartfelt reverence and veneration for him.

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় সেই বিস্মৃতপ্রায় মহাসাধকদের একজন যিনি বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে নিজের জীবন উৎস্বর্গ করেছিলেন এবং তার ফলে উপকৃত হয়েছে সমগ্র বাঙালীজাতি তথা সমগ্র বাংলা ভাষা। অথচ নিরলস সাহিত্যসেবী নিভৃতচারী এই মানুষ্টির সঙ্গে আপামর বাঙালীর সমাজের বিশেষ পরিচিতি তো নেই-ই, উৎসাহও নেই বললেই চলে। সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে অপরিচিত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটানা চল্লিশ বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে যে ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ আমাদের উপহার দিয়েছেন তার তুলনা বাংলা ভাষায়তো নেই-ই, এমনকি সমগ্র বিশ্বের আর কোন ভাষায় একক প্রচেষ্টায় এমন অনন্য সাধারণ অভিধান আছে কিনা সন্দেহ।

হরচরণের পৈতৃকভিটা বসিরহাট সাবডিভিশনের যশাইকাঠি গ্রামে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৩ শে জুন হরিচরণ মাতুলালয় রামনারায়ণহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাব শ্রী নিবারণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মা জগৎ মোহিনী দেবী যশাইকাঠি গ্রামেই হরিচরণের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলেও আট-নয় বছর বয়সে তিনি মামার বাড়িতে চলে যান এবং মামতো ভাইদের সঙ্গে একসাথে বসিরহাট মাইনরস্কুলে লেখাপড়া করতে থাকেন। এরপর বারো বছর বয়সে অন্য একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি মাসিক ‘দু-টাকা’ ছাত্রবৃত্তি পান। এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করে তিনি বাদুড়িয়াতে ‘লণ্ডন মিশনারী’ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়বার সময় আবার তাকে বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয় এবারে ‘আড়বেরিয়া’ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে ঘটে একটি স্মরণীয় ঘটনা হরিচরণের পিসতুতো দাদা শ্রী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদর বিভাগের খাজাঞ্চি ছিলেন। মামাতো ভায়ের পড়াশুনার আগ্রহ অথচ আর্থিক অসাচ্ছল্যের ছবি দেখে তিনি যুবক রবীন্দ্রনাথের কাছে হরিচরণকে নিয়ে যান। হরিচরণের সঙ্গে কথাবার্তায় সন্তুষ্ট কবি কিছু পরিমাণ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপরে হরিচরণ কোন এক পরিচত ছাত্রের পরামর্শে ‘জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে’ ভর্তির ইচ্ছা নিয়ে সেখানকার শিক্ষক শ্রী কালীনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন, কারণ অর্থাভাব। কালীনাথ মিত্র জানান দ্বিতীয় শ্রেণিতে যদি ফল ভাল হয়

তবে তিনি সাহায্য করেন। ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল হরচরণ 'দ্বিতীয়' হয়েছেন। বিনা বেতনে প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সুযোগ মিলল। কিন্তু এফ. এ পড়ার সময় আবার আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল, কোন এক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে পটল ডাঙার মল্লিকবাবুদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করলেন কারণ তাঁরা নাকি কোন কোন ছাত্রকে বেতনের অর্থ দান করে থাকেন। কলেজের সভাপতি তখন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, তাঁর কাছে দুটি সুপারিশপত্রসহ দরখাস্ত করলেন। বলাইবাহুল্য দুটি সুপারিশ পত্রের একটি ছিল শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নরেন্দ্রনাথ সেন দরখাস্ত মঞ্জুর করে পাঠালেন প্রিন্সিপাল বৈদ্যনাথ বসুর কাছে। অবশেষে বিনা বেতনে ১৮৯০-এ কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে পড়বার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি থেকে ফিরতে দেরী হওয়ায় মল্লিকবাবুদের ফাণ্ডের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেন। এখানেই তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ার ইতি টানতে হল।

প্রায় দুবছর কর্মহীনতায় কাটল, তবে এসময় তিনি কলকাতায় থেকে সংস্কৃত 'অধ্যাত্মরামায়ণের' বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদটি বহু পরে তাঁর মৃত্যুর পর 'দেবযান' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়। ইতিমধ্যে বিবাহিত, আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনে অতিষ্ট হয়েই হরিচরণকে কলকাতা ছাড়তে হল। কাজ পেলেন বাদুড়িয়া হাইস্কুলে চাকরি হেড পণ্ডিতের। এরপর ধান্যকুড়িয়া স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের কাজ করলেন কিছুদিন। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন মন দিতে পারেননা। আবার ফিরলেন কলকাতায়। নাড়াজোলের রাজবাড়িতে গৃহশিক্ষকতার কাজ করলেন বছর দেড়েক। ইতিমধ্যে কলকাতা টাউন স্কুলে হেড পণ্ডিতের চাকরী পেলেন, পিতার মৃত্যুর পর একাজে মন বসাতে পারলেন না। অস্থির হরিচরণ পিসতুতো দাদা যদুনাথের শরণাপন্ন হলেন আবার কবিগুরুর কাছে প্রার্থী হওয়া, কবিগুরুর নির্দেশে কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসরে সুপারিনটেনডেন্টের পদে যোগ দিলেন, শ্রাবণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে।

১৩০৯ সালে প্রবল বর্ষায় পতিসরে এসে কাজে যোগ দিলেন হরিচরণ এর ঠিক একমাস পর রবীন্দ্রনাথ পতিসরে আসেন জমিদারী পরিদর্শনে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ নবনিযুক্ত কর্মচারী হরিচরণকে নানান প্রশ্ন করেন, দিনের বেলায় কী করেন এই প্রশ্নের উত্তরে হরিচরণ জানান জমিদারীর জরিপ সংক্রান্ত কাজের নথি প্রস্তুত করেন আর রাতের বেলায় কী করেন কবি জানতে চাইলে জানান তিনি একটি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। বিষয় ছিল ইংরেজী থেকে সংস্কৃত অনুবাদ শিক্ষক, মুদ্রণের অভিপ্রায়ে তখন তিনি সেটির প্রেস কপি তৈরী করেছিলে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি দেখান। কবি কিন্তু কোন মন্তব্য না করেই সেটি ফেরৎ দেন।

এ সময় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাগ্রামে একটি ঘটনা ঘটে, আশ্রমে সংস্কৃত পড়াতেন শিবধন বিদ্যার্নব, পারিবারিক কারণে তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন। এর ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই পাতাঘরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে নির্দেশ আসে। "তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে (শান্তিনিকেতনে) পাঠাইয়া দাও"। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই মনে করতেন একজন ব্যাক্তি মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায় তার অবসর যাপন দিয়ে। সেই নিরিখেই তিনি হরিচরণ সম্পর্কে যথার্থ সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে এক মূহুর্ত বিলম্ব করেননি। যে মানুষ পতিঘরের বর্ষণশ্রান্ত রজনীতে সংস্কৃত কাব্যচর্চা করেন তাও আবার ছাত্রপাঠ্য অনুবাদ পুস্তকের মাধ্যমে, তিনিই যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ শিক্ষক হবেন সে বিষয়ে কবির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। ব্রহ্মচর্যা আশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে হরিচরণ শান্তিনিকেতন এলেন ১৯০২ খ্রীঃ জুলাই বা আগষ্ট মাসে। সেখানে তখন মাত্র দশ-বারোটি ছাত্র, শিক্ষক মাত্র পাঁচ ছজন। কাজে যোগ দেবার পর হরিচরণের উপর দায়িত্ব পড়ল। কবি একদিন তাঁকে ডেকে ছেলেদের জন্য একটি সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক লিখবার জন্য বললেন। এবং নিজের ৬-৭ পাতা লিখিত অসমাপ্ত 'সংস্কৃত প্রবেশের' পাণ্ডুলিপিটি হরিচরণের হাতে তুলে দিলেন। ধ্যাপণার সঙ্গে একাজেও হাত দিলেন হরিচরণ। ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'সংস্কৃত প্রবেশ' তিন খণ্ডে সমাপ্ত হল। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট অনাবশ্যক জটিলতা পরিহার ও ছাত্রদের মুখস্থ করার প্রবণতাকে বাধা দেওয়া।

'সংস্কৃত প্রবেশ' - রচনার সময়ই কবি তাঁকে বাংলা ভাষার একটি অভিধান রচনার নির্দেশ দেন, ১৩১২ বঙ্গাব্দেই হরিচরণ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে শুরু করলেন অভিধান রচনার কাজ। এ প্রসঙ্গে হরিচরণ লিখেছেন-

"অভিধান সংকলনে কেহই আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন না; কোন বিজ্ঞ আভিধানিকের সাহায্য লাভের আশা করিতে পারি নাই। নিজ বুদ্ধিতে যে পথ সহজ বুঝিয়াছিলাম, তাহাই আশ্রয় করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি"।[১]

আভিধানিকের প্রথম কাজ শব্দসংকলন। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বৌদ্ধগান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, শূন্য পুরাণ, মঙ্গল কাব্য, রামায়ণ। মহাভারত, বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে শুরু করে হরিচরণের ভাষায়-

"বর্তমান সাহিত্য পর্যন্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও নবীন বাঙলা গদ্যপদ্য পুস্তকসমূহ ও নাটক প্রভৃতি হইতে আবশ্যক বা উল্লেখযোগ্য সমস্ত শব্দই ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।"[২]

এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালার, বিদ্যাসাগরকৃত 'শব্দসংগ্রহ' এবং সেই সময় প্রকাশিত সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাংলা অভিধান' (১৯০৬) এবং রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' (১৯০৭) প্রভৃতির।

এভাবে কাজ বেশ কিছুদূর এগোনো সত্ত্বেও মূলতঃ সাংসারিক কারণে শান্তিনিকেতনের স্বল্প বেতনে সংসার না চলায় তাকে কলকাতায় অধিক মাইনের খুঁজতে আসতে হয়। গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় এসে সেণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়ের সাহায্যে তাঁর কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে হরিচরণের মানসিক শান্তি ছিলনা। একদিকে কবিগুরুর সান্নিধ্য অন্যদিগে অসমাপ্ত অভিধান হরিচরণকে স্বস্তি পেতে দিচ্ছিল না। অথচ শান্তিনিকেতন তখন ঋণভারে জর্জরিত, কবি কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কীভাবে আর্থিক দুর্গতি থেকে হরিচরণকে মুক্তি দেওয়া যায়, এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হরিচরণের অভিধানের জন্য আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তির ব্যাবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনেন হরিচরণকে। রাজার এই বৃত্তি হরিচরণকে ১৯১০-১৯১৯ পর্যন্ত পান এবং ১৯২০-২৩ বৃত্তির পরিমাণ ১০ টাকা বেড়ে মাসিক ৬০ টাকা হয়।

শান্তিনিকেতনে ফিরে হরিচরণ আবার অধ্যাপনা ও অভিধান রচনার কাজে হাত লাগান। পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০-এ (১৯২৩খ্রীঃ)

পাণ্ডুলিপি তো প্রস্তুত হল কিন্তু মুদ্রণ কার্য? অভিধান প্রকাশের জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে একটি সম্পাদক সংঘ গঠনের প্রস্তাব হলেও বিশ্বভারতীর তখন নিদারুণ আর্থিক দৈন্যের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হলেন হরিচরণ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কমিটি গঠিত হলেও আর্থিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ও পিছিয়ে গেল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অনুরূপ কারণে ছাপাতে পারলেন না।

তবু হরিচরণ আশা ছাড়লেন না। বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্যে নিজের অতিকষ্টে সঞ্চিত সামান্য অর্থে হরিচরণ নিজেই অভিধান মুদ্রণ কার্যে নেম,এ পড়লেন। রচনার নয় বছরপর ১৩৩৯ (১৩৩১) চৈত্র মাসে প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হল।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে অবসর মিলল। এবার অভিধান প্রকাশে উঠে-পড়ে লাগলেন হরিচরণ, কিন্তু বিধিবাম। পঞ্চাশটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর নগেন্দ্র নাথের মৃত্যু হল। এরপর বিশ্বকোষ প্রেসের এক কম্পোজিটর শ্রী মন্মথলাল মতিলালের সহযোগিতায় হরিচরণের 'শব্দকোষ' প্রতাপ ঘোষ লেনের শ্যাংকো প্রেসে অবশিষ্ট অংশ মুদ্রিত হয়। ১৩৪৮ সালের ৭ই ফাল্গুন দ্বিতীয়বার হরিচরণ অমানুষিক পরিশ্রমে বঙ্গীয় শব্দকোষের পাণ্ডলিপি দ্বিতীয়বার শেষ করেন। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৪৫খ্রীঃ মোট ১০৫ টি খণ্ডে অভিধান সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অক্লান্তশ্রম, অধ্যাবসায় ও মানসিক শক্তিবলে আটাত্তর বছর বয়সে এই সুদীর্ঘ কাজটি শেষ করেন হরিচরণ। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুবরণ করেছেন পৃষ্টপোষক রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র ও মৃত।

এই নিরলস শ্রমের স্বীকৃতি স্বরুপ হরিচরণ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, পেয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী স্বর্ণপদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মিলন ও তাঁকে সম্মানিত করে।

এই জ্ঞানতাপস সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মতামত আলোচনা করলে দেখব- সকলেই হরিচরণের শব্দকোষের সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছেন যে তাঁর অভিধানের সবচেয়ে বড় শক্তি তিনি সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রয়োগ দেখিয়েই থেমে যাননি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে রাশি রাশি প্রয়োগ দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা চলে-

"কিন্তু তাই বলিয়া এই অভিধান একদেশদর্শী নহে- মাত্র বাংলা- ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহ নহে। খাঁটি বাংলা –প্রাকৃতজ ও অর্দ্ধতৎসম শব্দ যতদূর সম্ভব ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদভিন্ন বাংলায় যে সমস্ত বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, সেগুলো ও যথাযোগ্য সমাদরের সহিত এই অভিধানে স্থান লাভ করিয়াছে"।[৩] (প্রবাস/বৈশাখ, ১৩৪৩)

শুধু তাই নয় শব্দের অর্থ বিচার ও উদ্ধৃতি প্রদর্শনে হরিচরণ অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন আবার প্রয়োজন অনুসারে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের ও অবতারণা করেছন যা সংস্কৃত ও বাংলা উভয় সাহিত্যিক এবং শিক্ষার্থীর কাছে অসাধারণ মূল্যবান।

নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক হওয়া সত্বেও হরিচরণ তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'- এ শব্দ সংকলন কালে কোনরূপ রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেননি। দীর্ঘদিন মুসলিম শাসনাধীন বাংলার বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল যা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, হরিচরণের শব্দ সংকলনে আরবি-ফারসি ভাষার বর্জনের বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব পায়নি বরং সংকলনে এই ধরণের শব্দগুলির মূল উৎস ও উচ্চারণ সহ বাংলা সাহিত্যে এদের যথার্থ প্রয়োগ দেখিয়েছেন। কাজেই আগামী দিনে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনা যখনই হোক না কেন হরিচরণের শব্দকোষ হবে তার প্রধান অবলম্বন।

সাধশতবর্ষের প্রাক্কালে এই বিস্মৃতপ্রায় মহাসাধক, একক নিষ্ঠাবান কর্মী মানুষটিকে স্মরণ করতে হলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলির যথাযোগ্য একটি সংকলন প্রস্তুত করা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সে সঙ্গে এও সত্য হরিচরণের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'– বর্তমানেও সমান প্রাসঙ্গিক ও বাংলা ভাষার গবেষক, লেখক সকলের কাছেই আজও অপরিহার্য একথা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখসূচী:

১। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়: 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯১৯)।
২। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়: 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', সাহিত্য অকাদেমী, প্রথম খণ্ড ১৯৬৬।
৩। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়: বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৪৩।
৪। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়: একটি জীবন, নির্মল কুমার নাগ, কোরক, জানুয়ারী: ২০১৬।
৫। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়: আকীর্ণ সৃষ্টির পথ, দেবাঙ্গন বসু, কোরক, জানুয়ারী: ২০১৬।